কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

# ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়

**প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান**
F.R.C.S (Glasgow)
জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন
**প্রফেসর অফ সার্জারী**
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ

**প্রকাশক**
কুরআন গবেষণা ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

**প্রকাশকাল**
১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০১
২য় সংস্করণ : এপ্রিল ২০০৩
৩য় সংস্করণ : জুন ২০০৭

**কম্পিউটার কম্পোজ**
**আম্মার কম্পিউটার্স**
৩৭/এ দক্ষিণ শাহজাহানপুর
ঢাকা ১২১৭
যোগাযোগ: ০১৯১৫-৭২৮০৪২

**মুদ্রণ ও বাঁধাই**
দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১১১২৭২
৭১২২৮৬৫
০১৭১২-১২৬০৫৮

**মূল্য ১৮.০০ টাকা**

## সূচীপত্র

১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম ৩
২. পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ ৭
৩. মূল বিষয় ১৭
৪. ইসলামের মৌলিক বিষয় ১৮
৫. আল-কুরআনে উল্লেখ নেই ইসলামে এমন কোন 'প্রথমস্তরের মৌলিক' বিষয় আছে কিনা? ২৫
৬. ইসলামের দ্বিতীয়স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ণয়ের সহজতম উপায় ২৭
৭. ইসলামের অমৌলিক বিষয় নির্ণয়ের সহজতম উপায় ২৭
৮. ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় জানা ও বোঝার ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যগুলোর সারসংক্ষেপ ২৮
৯. রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ্ সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ২৯
১০. বেশি ও কম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ জানা বা বুঝার ব্যাপারে রাসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামগণের সময়ের অবস্থা ৩০
১১. সাহাবায়ে কেরামগণের মতপার্থক্যের ভিত্তি যে সকল মৌলিক কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ৩১
১২. হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ৩৪
১৩. ফিকাহ্ শাস্ত্রের উৎপত্তির সময় এবং কারণ ৩৬
১৪. ফিকাহ শাস্ত্রে গুরুত্ব অনুযায়ী রাসূল (সা.) এর হাদীস তথা ইসলামের আমলের শ্রেণীবিভাগ ৩৭
১৫. ফিকাহ্ শাস্ত্রে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের সংজ্ঞায় যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ৩৮
১৬. রাসূলের (সা.) হাদীসকে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ করার সহজ উপায় ৪০
১৭. শেষ কথা ৪৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

**শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,**

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।



পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً لا أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

**অর্থ:** 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বললেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (বাকারা : ১৭৪)

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় (অর্থাৎ সামান্য অর্থ, সুযোগ-সুবিধা বা খ্যাতি ইত্যাদি পায়), তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

**অর্থ:** এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

**ব্যাখ্যা:** কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারীর অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে—

১. কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।



কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ০৮.০৯.২০০০ ইং তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০টায় বিয়াম মিলনায়তন, মাল্টি পারপাস হল, ৬৩ নিউইস্কাটন, ঢাকা, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন—এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

**ম. রহমান**

# পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের মূল উৎস তিনটি– আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি মূল উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

**ক. আল-কুরআন**

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।



যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

**খ. আল-হাদীস**

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.) এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

**গ. বিবেক-বুদ্ধি**

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

**وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.**

**অর্থ:** শপথ মানুষের জীবনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন।

**ব্যাখ্যা:** ৮ নং আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষকে তিনি জন্মগতভাবে কোনটি পাপ কাজ ও কোনটি সৎ কাজ অর্থাৎ কোনটি ন্যায় ও কোনটি অন্যায়, ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে তা বুঝার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্মগত এই ক্ষমতাকেই বিবেক বলা হয়।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে–

**وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامُ لِـــوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.**



**অর্থ:** রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। (আহমদ, তিরমিজি)

**ব্যাখ্যা:** হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে **عَقْلَ** বলা হয়েছে। এই **عَقْلَ** শব্দটিকে আল্লাহ- **اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.** ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

**إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.**

**অর্থ:** নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

**অর্থ:** যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْ قِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

**অর্থ:** জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

**ব্যাখ্যা:** আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

**সুধী পাঠক,** চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.)



তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক রকেটে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক রকেটে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে



কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

**কিয়াস ও ইজমা**

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা যে সকল বিষয়ে কুরআন-হাদীসের একের অধিক ব্যাখ্যার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে মূল উৎস তিনটির আলোকে অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস বলে। কিয়াসকারীকে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ ও অন্যান্য জ্ঞানে যেমন পারদর্শী হতে হয় তেমনি তার বিবেক-বুদ্ধিও প্রখর ও সমুন্নত থাকতে হয়।

আর কোন বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞের কিয়াসের ফলাফল যদি একই হয়, তবে ঐ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলা হয়। ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

কুরআন ও সহীহ হাদীসের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে। তাই সহজেই বুঝা যায়, কিয়াস ও ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের তথ্যের কোন মূল উৎস নয়।

এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াসের কোন সুযোগ নেই।

## সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.) ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি খাটানোর ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল—



## ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

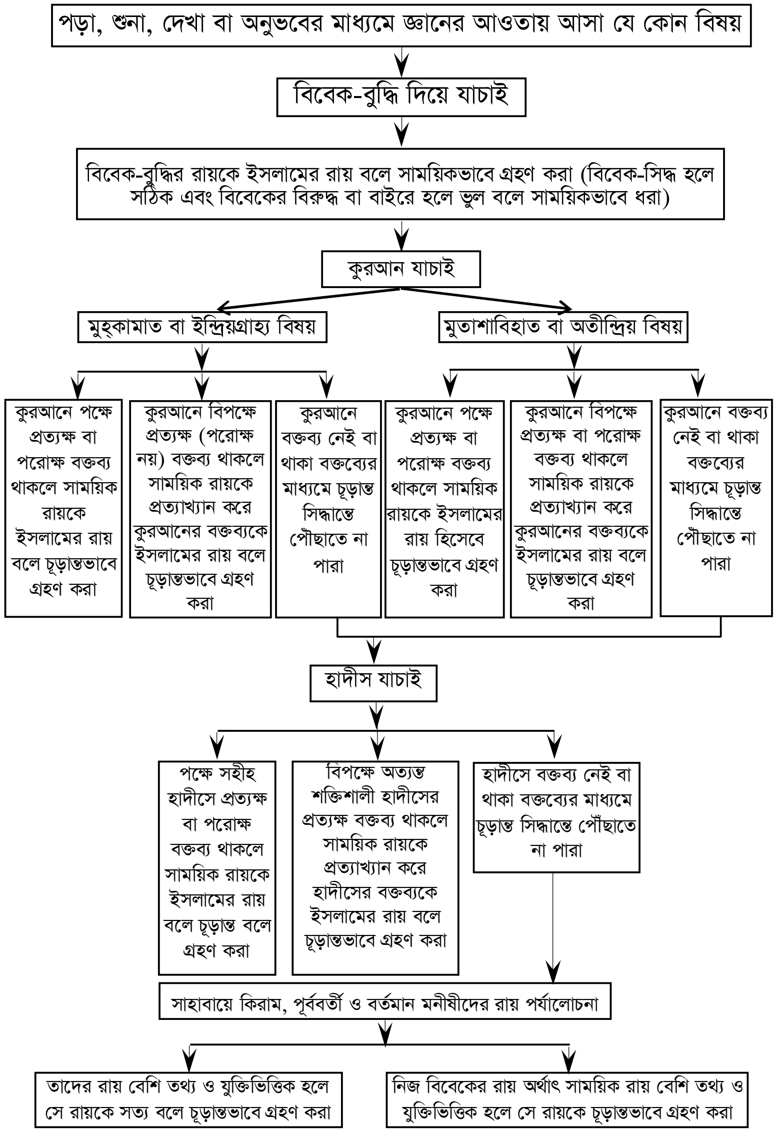

# মূল বিষয়

আদমশুমারি অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটি। এদের মধ্যে যারা মোটামুটিভাবে ইসলামী জীবন বিধানের নিষ্ঠাবান অনুসারী, তাদেরও ইসলামের অনুসরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

- ⑥ অধিকাংশের ইসলামের অনেক মৌলিক কাজ বাদ যাচ্ছে,
- ⑥ অনেকেই বহু আমৌলিক কাজকে মৌলিক মনে করে নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন,
- ⑥ অধিকাংশের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুন্নাহ বাদ যাচ্ছে,
- ⑥ আবার অনেকে কম গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুন্নাহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নিষ্ঠার সাথে আমল করে যাচ্ছেন।

সাধারণ জ্ঞানেই বলা যায়, যে কোন কর্মকাণ্ড উপরোক্তভাবে পালিত হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং যারা ঐভাবে তা পালন করছেন, তারা ঐ কর্মকাণ্ডের সকল কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবেন। মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ মুসলমানের উপরোক্তভাবে ইসলাম পালন করা। আবার এটাও নিঃসন্দেহে বলা যায়, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ ভাবে ইসলামী জীবন বিধানকে অনুসরণ করছেন, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ইসলামের সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন।

মুসলমানদের আমলের এই বিপর্যয়ের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে- তাদের অধিকাংশই জানেন না, কোনগুলো ইসলামের মৌলিক আর কোনগুলো অমৌলিক কাজ (আমল) এবং কোনগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ আর কোনগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। আর এই অজানা থাকারও একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, এমন কিছু তথ্য পরিষ্কার না থাকা, যা দ্বারা সহজে নির্ণয় করা যায় কোন্ কাজগুলো মৌলিক আর কোন্গুলো অমৌলিক এবং কোন হাদীসগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ।

তাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের এমন কিছু তথ্য জানিয়ে দেয়া যাতে তারা সহজে জানতে, বুঝতে বা বের করতে পারে ইসলামের কোন্ কাজগুলো মৌলিক তথা গুরুত্বপূর্ণ আর কোন্গুলো অমৌলিক তথা কম গুরুত্বপূর্ণ। এটা তাদের ইসলাম অনুসরণের পদ্ধতিকে শুধরিয়ে নিতে অর্থাৎ মৌলিক আমলগুলোর একটিও বাদ রেখে অমৌলিক আমল পালন থেকে দূরে থাকতে দারুণভাবে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস। আর এর ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারবে বলে আশা করা যায়।



# ইসলামের মৌলিক বিষয়

চলুন কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে বিষয়টি জানা যাক-

**বিবেক-বুদ্ধি**

কোন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়কে মৌলিকত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ভাগ করা যায়। যথা-

**১. প্রথম স্তরের মৌলিক**

এ হচ্ছে সেই বিষয়গুলো যা পালন না করলে কর্মকাণ্ডটি প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হয়।

**২. দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক**

এগুলো হচ্ছে প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। এর একটিও বাদ গেলে বিষয়টির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়টি ব্যর্থ হয়। ফলে মূল কর্মকাণ্ডটিও সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হয়। তাই এ ব্যর্থতাটি হয় পরোক্ষভাবে।

**৩. অমৌলিক বিষয়**

এ বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো যার সবকটিও বাদ গেলে মূল কর্মকাণ্ডটি ব্যর্থ হবে না তবে তাতে কিছু খুঁত বা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয় মৌলিকত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনভাগে বিভক্ত হবে। যথা-

**১. প্রথম স্তরের মৌলিক**

এগুলো হবে সে বিষয় যার একটিও বাদ গেলে মুসলিমের জীবন প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হবে।

**২. দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়**

এগুলো হচ্ছে সে বিষয় যার একটি পালন না করলে বিষয়টির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়টি সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হবে। ফলে একজন মুসলমানের জীবন আবার সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হবে। তবে এ ব্যর্থতা হবে পরোক্ষ।

**৩. অমৌলিক বিষয়**

এগুলো হবে সে বিষয় যার সবকটিও পালন না করলে কোন মুসলমানের জীবন ব্যর্থ হবে না, তবে তাতে কিছু খুঁত বা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

## ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ণয় করার সহজতম উপায়

**আল-কুরআন -**

**তথ্য-১**

**أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ط**

**অর্থ:** তোমরা কি কিতাবের (আল্লাহর কিতাবের) কিছু মানবে আর কিছু অস্বীকার করবে? তোমাদের মধ্যে যারা ঐ রকম করবে, দুনিয়ার জীবনে তাদের বদলা লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর পরকালে তাদের পৌঁছে দেয়া হবে কঠিন শাস্তির দিকে। (বাকারা:৮৫)

**ব্যাখ্যা:** মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহর কিতাবের কিছু মানবে আর কিছু মানবে না, দুনিয়ার জীবনে তাদের শুধু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। আর পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ তাদের ইহকালীন এবং পরকালীন উভয় জীবনটাই প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

**তথ্য-২**

**إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ط**

**অর্থ:** হেদায়েত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের জন্যে শয়তান ঐরূপ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা তাদের জন্যে দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয়কে (কিতাব বা দীনকে) অস্বীকারকারীদের বলে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। আল্লাহ তাদের গোপন কথা ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কি হবে যখন ফেরেশতাগণ



তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে থাকবে। এটাতো এ কারণেই যে, তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তার সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে অপছন্দ করেছে। এ কারণে তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দিবেন। (মুহাম্মাদ: ২৫-২৮)

**ব্যাখ্যা:** প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ কিতাবের মাধ্যমে হেদায়েত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে যায় তাদের কিছু অবস্থা বলেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে- জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবের বক্তব্যকে অনুসরণ করা আর কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াত ক'টিতে যা বলা হয়েছে তা হল-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকাল সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐ রকম আচরণের জন্যে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

এ আয়াত ক'টির তথ্যগুলো থেকেও তাই স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কিতাবের 'কিছু' অনুসরণ করলে আর 'কিছু' অনুসরণ না করলে পুরো জীবনটাই দুনিয়া ও পরকালে বিফলে যাবে।

④④ আল-কুরআনের উপরের দুটো তথ্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল-কুরআনের 'কিছু' মানলে বা অনুসরণ করলে এবং 'কিছু' না মানলে বা অনুসরণ না করলে মানুষের পুরো জীবনটাই প্রত্যক্ষভাবে ব্যর্থ হবে। তাহলে মৌলিক বিষয়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে, কুরআন অনুযায়ী, আল-কুরআনের ঐ বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিষয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'কিছু' বলতে আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন। 'কিছু' বলতে তিনি কি কুরআনে আলোচনাকৃত সকল কথার 'কিছু' বুঝিয়েছেন, না তিনি কুরআনের 'মূল' বিষয়গুলোর 'কিছু' বুঝিয়েছেন। ব্যাপারটি বুঝতে হলে নিম্নের তথ্যগুলো জানা ও বুঝা দরকার-

**তথ্য-১**

আল-কুরআনের আলোচিত বিষয়গুলোকে যে সকল ভাগে ভাগ করা যায়, তা হচ্ছে-

১.মূল বিষয়

- কুরআনের জ্ঞান অর্জন
- তৌহিদ
- রিসালাত
- আখিরাত
- রাসূলের অনুসরণ
- দীনকে বিজয়ী করা
- ঈমান
- ব্যবসা-বাণিজ্য
- সুদ
- লেনদেন
- জিনা ও তার শাস্তি
- চুরির শাস্তি
- টাকা-পয়সা খরচ
- দান-ছদাকা
- নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত
- জীবনের সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন
- পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও
- প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য
- পারস্পরিক আচার-ব্যবহার
- দাওয়াত
- যুদ্ধ-সন্ধি
- এতিমের দেখাশোনা
- বিবাহ, তালাক
- সম্পদ বণ্টন
- ওজু, গোসল
- নামাজের আগে ওজু-গোসল
- বিবেক-বুদ্ধি ইত্যাদি।

এই মূল বিষয়গুলো হচ্ছে সে বিষয়গুলো, যা মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করে পরকালে সফলকাম হওয়ার জন্যে অপরিহার্য।

**২. মূল বিষয়গুলো ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য**

মূল বিষয়গুলো ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন বক্তব্য আল-কুরআনে আছে। তাই মনীষীরা এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে আল-কুরআন। তবে কুরআনের সকল মূল বিষয় শুধু কুরআন দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। হাদীসের সাহায্য সেখানে অপরিহার্য।

**৩. উদাহরণ ও কাহিনী সম্বলিত বক্তব্য**

মূল বিষয়গুলো বুঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে আল-কুরআনে অনেক উদাহরণ (আমছাল) ও কাহিনী (কেচ্ছা) বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে এই উদাহরণ ও কাহিনীর আয়াত।



**৪. আরকান-আহকাম তথা মূল বিষয়গুলোর বাস্তবায়নের নিয়ম-কানুন সম্বলিত বক্তব্য**

মূল বিষয়গুলো বাস্তবায়নের আরকান-আহকাম বা নিয়ম-কানুন সম্বলিত অনেক বক্তব্য কুরআনে উল্লেখ আছে। তবে সকল আরকান-আহকাম কুরআনে নেই। রাসূল (সা.) তাঁর সুন্নাহের মাধ্যমে বাকিগুলোসহ সবগুলো জানিয়ে দিয়েছেন। আরকান-আহকামগুলোর কিছু মৌলিক আর কিছু অমৌলিক।

**৫. উৎসাহ নিরুৎসাহ প্রদানমূলক বক্তব্য**

মূল বিষয়গুলো পালনকে উৎসাহিত করার জন্যে এবং তা পালন থেকে বিরত থাকাকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে পুরস্কার বা শাস্তির ঘোষণামূলক অনেক বক্তব্যও আল-কুরআনে আছে।

**৬. মূল বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের (Options) বর্ণনা**

যেমন-

ক. সূরা বাকারার ২৭১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ط

**অর্থ:** যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তাতে কল্যাণ আছে কিন্তু যদি তা গোপনে ফকিরকে দাও তবে তা আরো ভালো।

**ব্যাখ্যা:** এখানে দান প্রকাশ্যে বা গোপনে দেয়া উভয় পদ্ধতিকেই আল্লাহ অনুমোদন দিয়েছেন। তবে গোপনে দেয়াকে বেশি ভালো বলেছেন।

**খ.** সূরা শুরার ৩৯ ও ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ط

**অর্থ:** যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। তবে যে ক্ষমা করে ও আপোস করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে।

**ব্যাখ্যা:** মহান আল্লাহ এখানে অত্যাচারিত বা আক্রান্ত হলে কী করণীয়, সে ব্যাপারে দুটো উপায়ের কথা বলেছেন। একটি হচ্ছে আক্রমণের অনুরূপ বা সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্ষমা এবং আপোস করা। অর্থাৎ আক্রান্ত হলে এ দুটি উপায়ের কোন একটি, অবস্থা অনুযায়ী যে কেউ গ্রহণ করতে পারে।

**৭. মূল বিষয়ের নফল দিক**

সূরা বনী-ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ط

**অর্থ:** আর রাত্রি বেলা তাহাজ্জুদ পড়। এটি তোমার জন্যে নফল।

**ব্যাখ্যা:** এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ নফল। অর্থাৎ পড়লে সওয়াব (ছোট ওজরের কারণে) না পড়লে মানুষের জন্যে গুনাহ নেই। অর্থাৎ এটি ইসলামের একটি অমৌলিক বিষয়।

④④ আল-কুরআনে আলোচিত বিষয়গুলোর সম্বন্ধে উপরের তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যায় যে, কিছু 'মূল' বিষয়কে কেন্দ্র করেই আল-কুরআনের সকল বক্তব্য আবর্তিত হয়েছে এবং কুরআনে ইসলামের অমৌলিক বিষয়েরও উল্লেখ আছে। কুরআনের ঐ 'মূল' বিষয়গুলো হচ্ছে এমন সব বিষয় যা মানুষের দুনিয়ার জীবন সুশৃঙ্খল, শান্তিময়, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে পরকালে সফল হওয়ার জন্যে অপরিহার্য। তাই সহজেই বুঝা যায়, সূরা বাকারার ৮৫ নং এবং সূরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮ নং আয়াতে আল্লাহ যে বলেছেন, কুরআনের কিছু মানলে আর কিছু না মানলে অথবা কিছু অনুসরণ করলে আর কিছু অনুসরণ না করলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের পুরো জীবনটা প্রত্যক্ষভাবে ব্যর্থ হবে, সেখানে তিনি ঐ 'মূল' বিষয়গুলোর কথাই বলেছেন। অর্থাৎ ঐ গুলোই হবে ইসলামের 'মূল' বা 'প্রথম স্তরের মৌলিক' বিষয়।

**আল-হাদীস**

**তথ্য-১**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةً يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلَانَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

**অর্থ:** আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক ব্যক্তি নামাজ ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা



প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি (রাসূল সা.) বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম রোজা রাখে, সদকা কম করে এবং নামাজও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হল পনিরের টুকরোবিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী। (আহমদ ও বায়হাকী)

**ব্যাখ্যা:** প্রতিবেশী বা কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া কুরআনের একটি মূল নিষিদ্ধ বিষয়। হাদীসখানির মাধ্যমে স্পষ্ট জানা ও বুঝা যায়, ঐ একটি নিষিদ্ধ কাজ করার জন্যে প্রথম মহিলাকে দোযখে যেতে হবে। অর্থাৎ তার অন্য সকল আমল সরাসরি ব্যর্থ ধরা হবে। তাই হাদীসখানি থেকে সহজে বুঝা যায়, আল-কুরআনের প্রতিটি মূল বিষয় ইসলামের একটি প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়।

**তথ্য-২**

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلَى جَنْبِهِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان.

**অর্থ:** ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে উদর ভরে খায় কিন্তু পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে। (বায়হাকী,শো'আবুল ঈমান)

**ব্যাখ্যা:** প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে অর্থাৎ তাদের খাদ্য পাওয়ার বিষয়ে কোন রকম ভূমিকা না রেখে নিজে পেট ভরে খাওয়া কুরআনের একটি মূল নিষিদ্ধ বিষয়। ঐ ধরনের কর্মপদ্ধতি যে অনুসরণ করবে, আলোচ্য হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) তাকে 'ঈমানদার নয়' তথা কাফির বা মুনাফিক বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ ধরনের কর্মপদ্ধতির জন্যে একজনের জীবনের অন্য সকল কর্মকাণ্ডকে সরাসরি ব্যর্থ ধরা হবে। তাই এ হাদীসখানি থেকেও বুঝা যায়, আল-কুরআনের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়।

**তথ্য-৩**

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَ كَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنًا لَّمْ يَعْصِكَ

طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ قَطُّ .

**অর্থঃ** জাবের (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জিব্রাইল (আ.) কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক শহরকে তার অধিবাসী সহ উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব, তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে যে মুহূর্তের জন্যেও তোমার নাফরমানী করে নাই। রাসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তার ও তাদের সকলের উপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যেও তার চেহারা মলিন হয় নাই।(বায়হাকী, শো'য়াবুল ঈমান)

**ব্যাখ্যাঃ** পাপাচার প্রতিরোধ করা কুরআনের একটি মূল নির্দেশ। এই একটি কাজ পালন না করার জন্যে হাদীসটিতে উল্লিখিত ব্যক্তিটির অন্য সকল আমল সরাসরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই এ হাদীসখানি থেকেও নিঃসন্দেহে জানা ও বুঝা যায় কুরআন শরীফে উল্লেখিত প্রতিটি মূল বিষয়ই ইসলামী জিন্দেগীর প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়।

④ হাদীস গ্রন্থে এ ধরনের অসংখ্য হাদীস আছে, যেখান থেকে স্পষ্টভাবে জানা ও বুঝা যায় আল-কুরআনের মূল বিষয়গুলো প্রত্যেকটিই ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের একটি পালন না করলে মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ ভাবে ১০০% ব্যর্থ হবে।

④④ কুরআন ও হাদীসের উল্লেখিত তথ্যসমূহ হতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় আল-কুরআনের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়।

## আল-কুরআনে উল্লেখ নেই ইসলামে এমন কোন 'প্রথম স্তরের মৌলিক' বিষয় আছে কিনা?

পরবর্তী যে প্রশ্ন সাধারণভাবে এসে যায় তা হচ্ছে, কুরআনে উল্লেখ নেই এমন কোন 'প্রথম স্তরের মৌলিক' বিষয় ইসলামে আছে কিনা? বিষয়টি বুঝতে হলে নিম্নের তথ্যগুলো জানা দরকার।

### ক. বিবেক-বুদ্ধি

ইসলামকে জানা ও বুঝার মাধ্যমগুলো (গুরুত্ব অনুযায়ী) হচ্ছে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি। এর মধ্যে কুরআন হচ্ছে স্বাধীন এবং নির্ভুল। হাদীস হচ্ছে কুরআনের অধীন। আর বিবেক-বুদ্ধি হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অধীন। কুরআনের বক্তব্য লিখে রেখে এবং মুখস্থ করে নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে



তা নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর সূরা আল-হিজরের ৯ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন, আল-কুরআনের একটি অক্ষরও যাতে কেউ কিয়ামত পর্যন্ত বদলাতে না পারে, সে দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। অন্যদিকে কুরআন নাযিল হওয়ার প্রথমদিকে রাসূল (সা.) হাদীস লিখতে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং তা প্রকৃতভাবে সংকলন শুরু হয়েছে রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের ২০০-২৫০ বছর পর। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের কয়েক প্রজন্মের (Generation) পর। আর বিবেক কোন ব্যাপারে মানুষের অন্তরে শুধু ইঙ্গিত দেয়, নিশ্চয়তা দেয় না। তাছাড়া বিবেক শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিতও হয়।

তাই এ কথা সহজেই বলা যায় যে, যে বিষয়গুলো একটিও না মানলে বা ইচ্ছা করে অনুসরণ না করলে মানুষের পুরো জীবনটা সরাসরি বিফলে যাবে (অর্থাৎ জীবনের মূল মৌলিক বিষয়) ঐ বিষয়গুলোর একটিও কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে নির্ভুলভাবে না জানিয়ে হাদীস বা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করেছেন বলে মনে হয় না।

### খ. আল-কুরআন

চলুন এখন দেখা যাক আল-কুরআনে এ ব্যাপারে কী কী তথ্য আছে-

**তথ্য-১**

সূরা নাহালের ৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

**অর্থঃ** আর তোমার ওপর যে কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করা হয়েছে তাতে রয়েছে সকল বিষয়ের বর্ণনা।

**ব্যাখ্যাঃ** আল্লাহ এখানে বলেছেন, আল-কুরআনে আছে মানুষের জীবনের সকল বিষয়ের বর্ণনা।

**তথ্য-২**

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

**অর্থঃ** আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে দীন হিসাবে মনোনীত করা হল। (মায়েদা : ৩)

**ব্যাখ্যা:** এ আয়াতটির পর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা.) মাত্র ৮১ দিন জীবিত ছিলেন। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, ইসলামের বিধি-বিধান এই আয়াতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

❑❑ এ দুখানি আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের সকল বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর (প্রথমস্তরের মৌলিকগুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) সবগুলো কুরআনে নেই। আর অমৌলিক বিষয় আছে খুবই কম।

তাই সহজেই বলা যায় এ দুখানি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ইসলামের সকল 'প্রথম স্তরের মৌলিক' বিষয় কুরআনে উল্লেখ আছে। অন্যভাবে বলা যায় যে বিষয় কুরআনে উল্লেখ নাই সেটি ইসলামের 'প্রথমস্তরের মৌলিক বিষয়' নয়।

## ইসলামের দ্বিতীয়স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ণয়ের সহজতম উপায়

ইসলামের দ্বিতীয়স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর (প্রথমস্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) কিছু আছে কুরআনে আর সবগুলো আছে সুন্নাহ বা হাদীসে। দ্বিতীয়স্তরের মৌলিক বিষয়ের একটি বাদ গেলে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রথমস্তরের মৌলিক বিষয়টি ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ আবার মানুষের পুরো জীবন ব্যর্থ হয়। তাই শুধু হাদীসের মাধ্যমে ২য় স্তরের মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সে হাদীসটি অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হবে এবং তার বক্তব্য কুরআনের কোন বক্তব্যের বিরোধী হতে পারবে না।

## ইসলামের অমৌলিক বিষয় নির্ণয়ের সহজতম উপায়

ইসলামের অমৌলিক বিষয়ের (যার সবকটিও বাদ গেলে মানুষের জীবন ব্যর্থ হবে না তবে তাতে কিছু খুঁত বা অসম্পূর্ণতা রয়ে যাবে) খুব কমই কুরআনে উল্লেখ আছে আর এর সবগুলো উল্লেখ আছে রাসূল (সা.) এর হাদীসে। কোন বিষয় ইসলামের অমৌলিক বিষয় হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে তা কুরআনের কোন বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী হতে পারবে না। কুরআনে উল্লেখিত অমৌলিক বিষয়ের একটি হল তাহাজ্জুদের নামাজ।



## ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় নির্ণয়ের উদাহরণ

নামাজ কুরআনে উল্লেখিত একটি মূল বিষয়। তাই তা ইসলামের একটি প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়। আর নামাজের আরকান-আহকামের মধ্যে যেগুলো মৌলিক তা হচ্ছে ইসলামের ২য় স্তরের মৌলিক বিষয়। এর কিছু আছে কুরআনে আর সবগুলো আছে হাদীসে। তবে নামাজের যে মৌলিক আরকান-আহকাম শুধুমাত্র হাদীসের মাধ্যমে নির্ণিত হবে সেগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী সহীহ হাদীস হতে হবে। এরপরও যেসব মৌলিক আরকান-আহকাম শুধুমাত্র হাদীসের মাধ্যমে নির্ণিত হয়েছে তার মধ্যে যেগুলোর ব্যাপারে ১০০% নিশ্চিত হওয়া যায়নি তাকে ফিকাহ শাস্ত্র ওয়াজিব নাম দিয়েছে এবং বলেছে ঐগুলো অস্বীকার করলে কেউ কাফির হবে না।

নামাজ ইসলামের একটি করণীয় বিষয়, একথাটি যদি কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ না থাকত কিন্তু সুন্নাহে থাকত তবে নামাজ হত ইসলামের একটি অমৌলিক বিষয়।

## ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় জানা ও বোঝার ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যগুলোর সারসংক্ষেপ

উপরে উল্লিখিত কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেকের সকল তথ্য পর্যালোচনা করলে নিশ্চিতভাবে যে কথাগুলো বলা যায় তা হচ্ছে–

১. আল-কুরআনের 'মূল' বিষয়গুলোর সব ক'টিই ইসলামের 'মূল' বা 'প্রথম স্তরের মৌলিক' বিষয়।

২. আল-কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়নি এমন কোন বিষয় ইসলামের 'প্রথম স্তরের মৌলিক' বিষয় নয়।

৩. ইসলামের 'দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক' বিষয়গুলোর কিছু আছে কুরআনে আর সবগুলো আছে সুন্নাহে। কোন হাদীসের বক্তব্য ঐ রকম বিষয় হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে সে হাদীসটিকে অবশ্যই সন্দেহমুক্ত অর্থাৎ মুতাওয়াতির সহীহ বা অত্যন্ত শক্তিশালী সহীহ হতে হবে এবং তা কুরআনের কোন বক্তব্যের বিরোধী হতে পারবে না।

৪. কুরআন ও সহীহ হাদীসের যে সকল বক্তব্য, কুরআনের কোন মূল বিষয় বা তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয় নয় অর্থাৎ ইসলামের প্রথম বা ২য় স্তরের মৌলিক বিষয় নয়, তা হচ্ছে ইসলামের অমৌলিক বিষয়। হাদীসের মাধ্যমে নির্ণিত অমৌলিক বিষয়ের কোনটি কুরআনের কোন বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী হতে পারবে না।

## রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

রাসূল (সা.) তাঁর নবুয়াতী জীবনে যা কিছু করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন তার নির্ভুলরূপ হল রাসূলের সুন্নাহ। যেমন-

ক. রাসূল (সা.) কুরআন বুঝে বুঝে পড়েছেন, কখনও না বুঝে পড়েননি, নামাজ কায়েম করেছেন, রোজা থেকেছেন, হজ্ব করেছেন। সুতরাং এগুলোর নির্ভুলরূপ হবে রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ।

খ. রাসূল (সা.) জেহাদ করেছেন, রাষ্ট্র চালিয়েছেন, বিচার করে ধনী চোরের হাত কাটার ব্যবস্থা করেছেন, হত্যার বদলে হত্যার ব্যবস্থা করেছেন, ব্যভিচারের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, সুদ বন্ধ করেছেন। সুতরাং এগুলো রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ।

গ. তিনি সত্য বলেছেন, মিথ্যা বলেননি। পরোপকার করেছেন। ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করেছেন। তাই এগুলোরও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ।

ঘ. রাসূল (সা.) বিয়ে করেছেন, সংসার করেছেন। পিতা, স্বামী ইত্যাদি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন। খাওয়া-দাওয়া করেছেন, ঘুমিয়েছেন, পেশাব-পায়খানা করেছেন। সুতরাং এরও নির্ভুলরূপ তাঁর সুন্নাহ।

ঙ. তিনি পোশাক পরেছেন, দাড়ি রেখেছেন, গোঁফ কেটেছেন, চুল ছেঁটেছেন, জুতা পরেছেন-তাই এগুলোর নির্ভুলরূপও হবে তাঁর সুন্নাহ।

চ. উপরোল্লিখিত সকল কাজের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তিনি যা কিছু করেছেন, বলেছেন ও সমর্থন করেছেন-তার সবগুলোর নির্ভুলরূপ হবে রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ।

সাধারণ জ্ঞানেই বুঝা যায়, রাসূল (সা.) এর ঐ সকল কথা, কাজ বা সমর্থন কোনভাবেই সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। অর্থাৎ তার কোনোটা অবশ্যই বেশি এবং কোনোটা কম গুরুত্বপূর্ণ হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এটা জানা বা বুঝার সহজ উপায় কী? আর এটা জানা ও বুঝা খুবই দরকার। কারণ তা না হলে মনের অজান্তেই রাসূল (সা.) এর সুন্নাহের অনুসরণের সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ বাদ পড়ে যাবে বা অনেক কমগুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আগে আমল করা হয়ে যাবে। আর এর ফলে রাসূল (সা.) এর সুন্নাহের অনুসরণ করে অবশ্যই দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ পাওয়া যাবে না।



## বেশি ও কম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ জানা বা বুঝার ব্যাপারে রাসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামগণের সময়ের অবস্থা

বিষয়টির ব্যাপারে বিখ্যাত মনীষী শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র.) এর 'আল ইনসাফ ফি বয়ানী আসবাবিল ইখতিলাফ' (মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়) নামক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য একটু গুছিয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

**১. রাসূল (সা.) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি**

রাসূল (সা.) যখন কোন আমল করতেন, সাহাবায়ে কেরাম তা দেখতেন। তারপর তাঁরা রাসূল (সা.) এর করা নিয়মে ঐ আমলটি করতেন। সাধারণত এটাই ছিল রাসূল (সা.) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি। যেমন-

- রাসূল (সা.) ওজু করতেন। সাহাবায়ে কেরাম দেখতেন তিনি কী নিয়মে ওজু করছেন। এটি ওজুর নফল বা এটি ওজুর আদব- এভাবে বিশ্লেষণ করে রাসূল (সা.) বলে দিতেন না।
- রাসূল (সা.) নামাজ পড়তেন, সাহাবায়ে কেরাম তা দেখতেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম ঐ দেখা নিয়ম অনুযায়ী নামাজ পড়তেন।
- তিনি হজ্ব পালন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর হজ্ব পালন পদ্ধতি দেখে সে অনুযায়ী হজ্ব পালন করতেন।
- ওযুতে চার ফরজ বা ছয় ফরজ এভাবে ব্যাখ্যা করে ওযু বা অন্য কোন আমলের ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলে দিতেন না।

**২. রাসূল (সা.) সাধারণত সাহাবীদের সাধারণ সভায় দীনি কথাবার্তা বলতেন এবং শিক্ষা দিতেন। একজন সাহাবী-**

- রাসূল (সা.) কে যেভাবে ইবাদাত করতে দেখতেন এবং তাঁর থেকে যেভাবে ফতোয়া ও ফয়সালা শুনতেন, সেভাবেই তা আয়ত্ত করে নিতেন এবং আমল করতে থাকতেন।
- অতঃপর তিনি পরিবেশ, পরিস্থিতি ও অবস্থা বিচার করে রাসূল (সা.) এর ঐ সব বক্তব্য ও আমলের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নির্ণয় করে নিতেন।
- এভাবে তারা কোন হুকুমকে নির্ণয় করেন 'মুবাহ', কোনটিকে 'মুস্তাহাব' এবং কোনটিকে 'মানসুখ' (রহিত)।
- ঐ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামগণ দার্শনিক দলিল প্রমাণ অবলম্বন করতেন না। তাঁরা অবলম্বন করতেন তাঁদের মনের প্রশান্তি, প্রসন্নতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

৩. রাসূলের (সা.) যুগ পর্যন্ত এভাবেই লোকেরা আমল করতেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামগণ বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যে যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই নেতৃত্ব লাভ করেছেন। এ সময়ে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন ঘটনা ও সমস্যাবলী তাঁদের সামনে আসতে থাকে এবং লোকেরা ঐ সব বিষয়ে তাঁদের নিকট ফতোয়া ও ফয়সালা চাইতে থাকে। প্রত্যেক সাহাবী নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী ঐ সব ব্যাপারে ফতোয়া ও ফয়সালা দিতেন–

ক. প্রত্যেক সাহাবী তাঁর জানা প্রমাণিত জ্ঞানের (কুরআন ও সুন্নাহ) আলোকে জবাব দিতেন।

খ. ঐভাবে যদি সমাধান না পাওয়া যেত তবে তাঁরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, তা হচ্ছে-

⑥ রাসূল (সা.) এর দেয়া যে সকল ফয়সালা বা বিধান তিনি জানতেন সেগুলো, কী কারণ ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে রাসূল (সা.) দিয়েছেন, তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতেন। অতঃপর তাঁর কাছে জানতে চাওয়া প্রশ্নটির কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে, রাসূল (সা.) এর দেয়া যে ফয়সালার কারণ ও উদ্দেশ্যের মিল দেখতে পেতেন সেটাতে তারা রাসূল (সা.) দেয়া ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালা বা বিধান দিয়ে দিতেন।

⑥ পূর্ণ তাকওয়া ও ঈমানদারীর সঙ্গে তাঁরা ঐ কাজ করতেন।

❷❷ এ সকল তথ্যের আলোকে সহজেই বুঝা যায় সাহাবায়ে কিরামগণের যুগেই সুন্নাহ বুঝা নিয়ে মতপার্থক্য আরম্ভ হয়েছিল।

## সাহাবায়ে কেরামগণের মতপার্থক্যের ভিত্তি যে সকল মৌলিক কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল

### ক. রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ জানা থাকা বা না থাকার পার্থক্য

এটাই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্যের প্রধান কারণ। সকল সাহাবী রাসূল (সা.) এর সকল সুন্নাহ জানতেন না। আর তা জানা সম্ভবও ছিল না। কারণ রাসূল (সা.) এর ২৪ ঘন্টার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত সকল সাহাবী তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর সকল কাজ দেখবেন বা সকল কথা শুনবেন– এটা বাস্তব সম্মত নয়। যে সাহাবীর (রা.) কোন একটা প্রশ্ন বা সমস্যা সম্বন্ধে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য জানা থাকতো না, সে বিষয়ে তিনি বাধ্য হয়ে ইজতিহাদ (কুরআন বা



হাদীসে উপস্থিত থাকা তথ্যের আলোকে নিজ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্তে আসা) করতেন। পরবর্তীতে এরূপ ইজতিহাদের যে অবস্থা হত তা হচ্ছে –

১. কখনো এরূপ ইজতেহাদ হাদীসে রাসূলের অনুরূপ হয়ে যেত।

২. কখনো একটি মাসআলা সম্বন্ধে দু'জন সাহাবীর মধ্যে আলোচনা হত। এ আলোচনায় কোন সহীহ হাদীস তাঁদের সামনে এসে গেলে মুজতাহিদ তাঁর ইজতেহাদ পরিত্যাগ করে হাদীসটি গ্রহণ করতেন।

৩. কখনো এমন হতো যে, ইজতিহাদকারী সাহাবীর নিকট হাদীস পাঁছেছে বটে কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য পন্থায় পৌঁছায়নি। এমন অবস্থায় মুজতাহিদ বর্ণনাটি পরিত্যাগ করতেন এবং নিজের ইজতিহাদের ওপর আমল করতেন।

৪. কখনো এমনও হত যে, মুজতাহিদ সাহাবীর নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীসই পৌঁছেনি। ফলে তাঁর ইজতেহাদ হাদীসে রাসূল (সা.) এর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল না হলেও তার ওপর তিনি আমল করে যেতেন।

### খ. রাসূল (সা.) এর কাজের গুরুত্ব নির্ণয়ের পার্থক্য

সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এটি। নবী কারীম (সা.) কে একটি কাজ করতে সাহাবায়ে কেরামগণ দেখতেন কিন্তু মানুষের বিবেক-বুদ্ধির প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে কাজটির গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হত। ফলে কেউ রাসূল (সা.) এর উক্ত কাজটিকে মনে করেছেন ইবাদাত তথা গুরুত্বপূর্ণ। আর কেউ তাকে মনে করেছেন মুবাহ অর্থাৎ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উদাহরণস্বরূপ হজ্বের সময় রাসূল (সা.) এর আবতাহ উপত্যকায় অবতরণের ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়। আবু হুরায়রা (রা.) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) এর দৃষ্টিতে এই অবতরণের ঘটনাটি ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তাঁরা এটাকে হজ্বের সুন্নত বলে গণ্য করতেন। কিন্তু আয়েশা (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে তিনি সেখানে ঘটনাক্রমে অবতরণ করেছিলেন। সুতরাং সেটা হজ্বের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

### গ. রাসূল (সা.) এর কাজের বা বক্তব্যের কারণ বা উদ্দেশ্য বুঝতে পারা না পারার পার্থক্য

সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার পিছনে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আর এটাও হয়েছে কোন একটি বিষয় বা কথার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতায় মানুষে মানুষে স্বাভাবিক পার্থক্য থাকার কারণে।

উদাহরণস্বরূপ মুসনাদে আহমদে উল্লেখিত ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করা যায়। হাদীসটি হচ্ছে- 'রাসূল (সা.) বলেছেন, মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়।' এ বক্তব্য শুনে আয়েশা (রা.) বললেন, 'এটা ইবনে উমরের ধারণাপ্রসূত কথা। রাসূল (সা.) এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এবং স্থান, কাল, পাত্র তিনি আয়ত্ত করে রাখেননি।' প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ইয়াহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন, তার আপনজনরা মাতম করছে। তিনি বললেন, 'এরা এখানে তার জন্যে কান্নাকাটি করছে, অথচ কবরে তার আযাব হচ্ছে'। এখানে ইবনে উমর (রা.) রাসূল (সা.) এর বক্তব্যের যথার্থ উদ্দেশ্য আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি মনে করেছেন কান্নাকাটির কারণেই মৃত ব্যক্তির আযাব হয়েছে এবং তা সকল মৃত ব্যক্তির জন্যে প্রযোজ্য। অথচ রাসূল (সা.) এর বক্তব্য ছিল কেবল উক্ত মৃত ব্যক্তির জন্যে নির্দিষ্ট (Specific) এবং বক্তব্যে তিনি কান্নাকাটিকে আযাবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেননি।

এ বিষয়ে আর একটি উদাহরণ হচ্ছে– কফিন অতিক্রমকালে দাঁড়ানোর সুন্নাহটি। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী (রা.) বলেছেন, দাঁড়ানোর কারণ হচ্ছে প্রত্যেক কফিনের সঙ্গে ফেরেশতা থাকে। তাই ঐ ফেরেশতার সম্মানার্থে দাঁড়াতে হয়। এ মত অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি মুমিন হোক বা কাফের হোক- সর্বাবস্থায় দাঁড়াতে হবে। আবার কেউ বলেছেন, মৃত্যু ভীতির জন্য দাঁড়াতে হয়। এ মত অনুযায়ীও মৃতু ব্যক্তি মুমিন হোক বা কাফের হোক-উভয় অবস্থাতেই দাঁড়াতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, রাসূল (সা.) এর পাশ দিয়ে এক ইয়াহুদীর লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে ইয়াহুদীর লাশ অতিক্রম করাকে তিনি অপছন্দ করলেন, তাই তিনি দাঁড়ালেন। এটি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে দাঁড়ানোটা শুধু কাফিরের কফিনের জন্য নির্দিষ্ট।

**ঘ. ভুলে যাওয়ার কারণে মতপার্থক্য**

সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার আর একটি কারণ হচ্ছে ভুলে যাওয়া, যা মানুষের জন্যে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এর উদাহরণ হচ্ছে জামাউল ফাওয়ায়িদে উল্লেখিত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনাকৃত একটি হাদীস। ইবনে উমর (রা.) বলতেন, 'রাসূল (সা.) একটা উমরা করেছেন রজব মাসে'। এ বক্তব্য অবগত হয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'ইবনে উমর ব্যাপারটা ভুলে গেছেন'।



**ঙ. সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে মতপার্থক্য**

কোন বিধানের বৈপরীত্য নিরসন করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ হচ্ছে- 'মুতআ বিয়ে'। রাসুল (সা.) খাইবার যুদ্ধের সময় 'মুতআ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর আবার তা নিষেধ করে দেন। অতঃপর 'আওতাস' যুদ্ধের সময় আবার মুতআ বিয়ের অনুমতি দেন কিন্তু এবারও যুদ্ধের পর অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন। এখন এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর মত হলো, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 'মুতআর' অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রয়োজন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। সুতরাং অনুমতি প্রয়োজন ও অবস্থার গুরুত্বের সাথে সম্পর্কিত। এ জন্যে অনুমতি স্থায়ী। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীর মত এর বিপরীত। তাদের মত হলো, মুতআ বিয়ের অনুমতিটা ছিল মুবাহ পর্যায়ের। নিষেধাজ্ঞা সে অনুমতিকে স্থায়ীভাবে রদ (মানসুখ) করে দিয়েছে।

⑥⑥ উপরোক্তভাবে রাসূল (সা.) সুন্নাহের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে এ মতপার্থক্য তাবেয়ী ও পরবর্তীদের যুগেও পৌঁছায় এবং তা আরো ব্যাপক হয়।

## হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

'হাদীস' শব্দটি কুরআনে বক্তব্য, বাণী, খবর, ঘটনা, স্বপ্ন ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন যেখানে হাদীস বলতে কারো বক্তব্য, বাণী বা কথা বুঝিয়েছে সেখানে এগুলোর নির্ভুল, হুবহু তথা অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, যতিচিহ্ন ইত্যাদিসহ উল্লিখিত রূপকে বুঝিয়েছে। অর্থাৎ কুরআন যখন হাদীস শব্দটি দ্বারা রাসূল (সা.) এর বক্তব্য, বাণী বা কথা বুঝিয়েছে তখন রাসূল (সা.) এর ঐ সকল বিষয়ের নির্ভুল, হুবহু তথা অক্ষর শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, যতিচিহ্নসহ উল্লিখিত রূপকে বুঝিয়েছে। তাই কুরআন অনুযায়ী রাসূল (সা.) এর হাদীস শব্দের সংজ্ঞা হল রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের হুবহু, নির্ভুল বা দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উল্লিখিতরূপ।

হাদীস শাস্ত্রে প্রথম দিকে 'হাদীস' শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছিল, 'রাসূল (সা.) এর পরের চার স্তরের (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী, তাবে তাবে-তাবেয়ী) ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের নিজ বুঝের স্বীয় ভাষায় বর্ণনা করা বক্তব্যকে'। এই সংজ্ঞার দুর্বল দিকগুলো ছিল–

১. ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি মুনাফিকও হতে পারা,
২. মানুষের বুঝের ভুল হতে পারা এবং
৩. নিজ শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপনের সময়ও মানুষের ভুল হতে পারে।

এ দুর্বলতার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে বানানো বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে রাসূল (সা.) বলেননি এমন অনেক কথা রাসূল (সা.) এর কথা তথা হাদীস হিসেবে চালু হয়ে যায়। ফলে ইসলামে ব্যাপক বিভ্রান্তি ঢুকে পড়ে। মিথ্যা বা ভুল হাদীসের ব্যাপকতা কী পরিমাণ ছিল তা সহজে বুঝা যায় ইমাম বুখারীর ছয় লক্ষ হাদীস যাচাই করে পুনরুক্তি বাদ দিয়ে মাত্র ২৫০০ (আড়াই হাজার) হাদীস, তাঁর মতে, 'সহীহ' পাওয়ার তথ্যটির মাধ্যমে।

হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এটি বুঝতে পেরে হিজরী ৩ (তিন) শতকে হাদীস বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ যাচাই করার জন্যে আসমা-উর-রিজাল নামের এক বিস্ময়কর গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস বর্ণনাকারীর তাকওয়া, পরহেজগারী, সত্যবাদিতা, পরিচিতি, বংশ, স্মরণশক্তি, বিচক্ষণতা ইত্যাদি দিক বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা সূত্রের (সনদ) ত্রুটিহীনতার উপর ভিত্তি করে হাদীসকে 'সহীহ' ও 'গায়ের সহীহ' নামে ভাগ করেন। মুহাদ্দিসগণ এটি জানতেন যে তাদের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী 'সহীহ্ হাদীস' বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝায় না। তাই তারা বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে ধারণা দেয়ার জন্যে সহীহ হাদীসকে আবার ৪ (চার) ভাগে ভাগ করেন। যথা-

**১. মুতাওয়াতির সহীহ**

যে সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রতি স্তরে অসংখ্য তাকে মুতাওয়াতির সহীহ হাদীস বলা হয়। এ সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১০০%।

**২. মশহুর সহীহ**

যে সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে তিন জনের কমে নামে নাই তাকে মশহুর সহীহ হাদীস বলা হয়। এ সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের চেয়ে কম।

**৩. আজিজ সহীহ**

যে সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে দুই জনের কমে নামে নাই। আজিজ সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মশহুর সহীহ হদীসের চেয়ে কম।



**৪. গরীব সহীহ**

যে সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে ১ (এক) জন তাকে গরীব সহীহ হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম।

বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?' নামক বইটিতে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় সুন্নাহ এবং হাদীস শাস্ত্রে উল্লেখিত তথা সাধারণভাবে চালু হয়ে যাওয়া হাদীস শব্দের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। সুন্নাহ হল রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের নির্ভুল রূপ। কিন্তু সাধারণভাবে চালু 'হাদীস' শব্দটির অর্থ তা নয়। তাইতো হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী সকল সুন্নাহ হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়।

## ফিকাহ শাস্ত্রের উৎপত্তির সময় এবং কারণ

রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ থেকে ইসলামের বিধি-বিধান বের করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামগণের সময়েই মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগে তা আরো ব্যাপক হয়। পরবর্তীতে মুজতাহিদগণ দেখলেন, পূর্বে ইখতিলাফপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে কোন নির্দিষ্ট বিধি অনুসরণ করা হয়নি। তা করলে তাদের ইজতিহাদসমূহ, ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত (মাহফুজ) হত। তাই মুজতাহিদগণ এ বিষয়ে মূলনীতি (উসূল) নির্ধারণ করে গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। ইমাম শাফেয়ী (রা.) এ বিষয়ে (উসূলে ফিক্‌হের) প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনিই উসূলে ফিক্‌হের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এরপর উসূলে ফিকাহ নিয়ে অনেক চিন্তা-গবেষণা করা হয় এবং বর্তমান যে ফিকাহ শাস্ত্র আমাদের নিকট আছে তা পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের অনেক কষ্ট-সাধনা ও চিন্তা-গবেষণার ফল। এটা তৈরি করে দিয়ে তারা জাতির অনেক বড় খেদমত করেছেন। ঐ উসূলে ফিকাহের ভিত্তিতে মুজতাহিদগণ যেমন বের করেছেন ইসলামী শরীয়ায় কোন্ আমল তথা কোন হাদীস বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাঁরা বের করেছেন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের বিধান।

## ফিকাহ শাস্ত্রে গুরুত্ব অনুযায়ী রাসূল (সা.) এর হাদীস তথা ইসলামের আমলের শ্রেণীবিভাগ

সুধী পাঠক, চলুন এখন দেখা যাক, ফিকাহ শাস্ত্র হাদীস তথা ইসলামের সকল আমলকে গুরুত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করে কিভাবে ভাগ করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে রাসূল (সা.) এর জীবনের সকল কাজ গুরুত্ব অনুযায়ী একই পর্যায়ের নয়। তাই রাসূল (সা.) এর হাদীসের অনুসরণের সময় যাতে গুরুত্ব অনুযায়ী আমল করা যায়, সে জন্যে ফিকাহ শাস্ত্র রাসূল (সা.) এর সকল হাদীস তথা ইসলামের সকল কাজকে চার ভাগে ভাগে করেছে। যথা—

**১. ফরজ**

গুরুত্বের দিক দিয়ে যে হাদীসগুলোর অবস্থান সবার উপরে, ফিকাহ শাস্ত্র তার নাম দিয়েছে ফরজ। ফিকাহ শাস্ত্র মতে, ফরজ অস্বীকারকারী কাফির। কঠিন ওজর ছাড়া ফরজ ত্যাগ করা বড় গুনাহের কাজ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ফরজ দু'প্রকার। ফরযে আইন- যা সকল মুসলমানের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে করা অপরিহার্য। যেমন- কুরআনের জ্ঞান অর্জন, নামাজ, রোজা ইত্যাদি। ফরযে কেফায়া- যে ফরজগুলো ব্যক্তিগতভাবে নয়, সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য। অর্থাৎ যে ফরজ কিছু লোকে আদায় করলে সকলের জন্যে আদায় হয়ে যায়। যেমন- জানাযার নামাজ, মৃত ব্যক্তির দাফন ইত্যাদি।

**২. ওয়াজিব**

ফিকাহ শাস্ত্র, রাসূল (সা.) এর যে হাদীসগুলো গুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে, ফিকাহ্সাস্ত্র তার নাম দিয়েছে ওয়াজিব। এ কাজগুলোও সকল মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য। ওয়াজিব কাজ বিনা ওজরে ত্যাগ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ অর্থাৎ কবিরা গুনাহ। তবে ওয়াজিব অস্বীকার করলে কেউ কাফির হয় না।

**৩. সুন্নাত**

রাসূল (সা.) এর যে হাদীসগুলো গুরুত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে, ফিকাহ শাস্ত্র তার নাম দিয়েছে সুন্নাত। সুন্নাত দু'প্রকার— মুয়াক্কাদাহ এবং গায়েরে মুয়াক্কাদাহ।

যে আমলগুলো রাসূল (সা.) প্রায় সময় করেছেন এবং ওযর ব্যতীত কখনও পরিত্যাগ করেননি, তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলে। তবে যারা তা করেননি, তাদেরকে রাসূল (সা.) সতর্কও করেননি। এ ধরনের সুন্নাহ বিনা ওযরে ছেড়ে দেয়া বা ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস করা গুনাহ। তবে অস্বীকার করলে কাফির হবে না।



যে কাজগুলো রাসূল (সা.) করেছেন আবার কখনও ছেড়েও দিয়েছেন তাকে সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ বলে। এ সুন্নাহগুলো করলে সওয়াব, না করলে গুনাহ হয় না।

**৪. মুস্তাহাব বা নফল**

ফিকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী মুস্তাহাব আমল হচ্ছে সে হাদীসগুলো যা রাসূল (সা.) মাঝে মাঝে করেছেন তবে অধিকাংশ সময় করেননি। এ আমল করলে সওয়াব আছে তবে না করলে গুনাহ হয় না।

## ফিকাহ শাস্ত্রে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের সংজ্ঞায় যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়

ফিকাহ শাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী শুধু ফরজ অস্বীকার করলে কাফির হয় কিন্তু ওয়াজিব, সুন্নাহ ও মুস্তাহাব অস্বীকার করলে কাফির হয় না। কিন্তু এ কথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআনের কোন একটি বক্তব্য এবং রাসূলের (সা.) কোন একটি সুন্নাহ তথা নির্ভুল হাদীস অস্বীকার করলে অবশ্যই কাফির হবে। কারণ কুরআনের কোন একটি বক্তব্য অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার করা। আর রাসূল (সা.) এর কোন একটি সুন্নাহ তথা নির্ভুল হাদীস অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে রাসূল (সা.) কেই অস্বীকার করা। তাহলে ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল (মুস্তাহাব) অস্বীকার করলে কাফির হবে না কেন? চিন্তার বিষয়, তাই না? ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব অস্বীকার করলে কাফির না হওয়ার কারণ হচ্ছে ঐগুলো যে, রাসূল (সা.) করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন অথবা ঐ ভাবে বা ঐ রকম গুরুত্ব দিয়ে করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন তা ১০০% নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না।

## ফিকাহ শাস্ত্রে হাদীস তথা ইসলামের সকল কাজকে উপরোক্তভাবে নামকরণের যে দিকগুলো বর্তমান মুসলমান সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করেছে

চলুন এখন ফিকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী হাদীস তথা ইসলামের সকল কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী উপরোক্ত সংজ্ঞা ও নামকরণের যে দিকগুলো বর্তমান মুসলমান সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করেছে সেগুলো দেখা যাক-

**ক. ফরজ বিষয়গুলো বাছাই করার সমস্যা এবং তার ফল**

ফিকাহ শাস্ত্রে যে হাদীসগুলো অপরিহার্য, অস্বীকার করলে কাফির হয় এবং পালন না করলে কবীরা গুনাহ হয়- তাকে ফরজ বলা হয়েছে। যেহেতু রাসূল (সা.) নিজে কোন সুন্নাহগুলো ফরজ তা নির্দিষ্ট করে বলে যাননি, সেহেতু কোন

সুন্নাহটি ফরজ বিভাগে পড়বে তা কেউ সহজে বলতে চাননি। কারণ, কাফির ঘোষণা দেয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আর কোন হাদীস সুন্নাহের হুবহু রূপ কিনা তা ১০০% নিশ্চয়তা দিয়ে বলা প্রায় অসম্ভব। তাই ১৪০০ বছর পরেও আজ ফরজ সুন্নাহগুলোর তথা ফরজ বিষয়গুলোর সঠিক এবং পরিপূর্ণ কোন লিস্ট মুসলমান জাতির সামনে হাজির নেই। আর এই শূন্যস্থান পূরণ করেছে অদূরদর্শী লোক দ্বারা তৈরি করা ফরজ সুন্নাহ কাজগুলোর কিছু অসতর্ক তালিকা। ঐ তালিকার বদৌলতে আজ অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান জানে ইসলামে ফরজ সুন্নাহ বা ফরজ আমল হচ্ছে ১৪০টির মত। যথ- নামাজের ১৩টি, রোজার ৬০টি (৩০ রোজা, ৩০ নিয়াত), হজ্বের ৩টি, ওজুর ৪টি, গোসলের ৩টি ইত্যাদি। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঐ ১৪০টি ফরজ হচ্ছে আল-কুরআনে বর্ণিত ৮ বা ১০ টি প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় বা সেগুলোর মৌলিক আরকান-আহকাম। ঐ অসতর্ক লিস্টের বদৌলতে সাধারণ মুসলমানরা প্রকৃতভাবে মাত্র ৮-১০টা কাজকেই ফরজ হিসেবে জানে এবং মানে। অথচ ইসলামে এর বাইরে অনেক প্রথম স্তরের মৌলিক কাজ আছে।

**খ. ওয়াজিব বিষয়গুলো বাছাই করার সমস্যা এবং তার ফল**

ফিকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী ওয়াজিব হচ্ছে ঐ অপরিহার্য বিষয়গুলো যা অস্বীকার করলে কাফির হয় না কিন্তু অনুসরণ না করলে কবীরা গুনাহ হয় এবং গুরুত্ব অনুযায়ী যার অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। এই শর্ত পূরণ করে ওয়াজিব কাজগুলো বাছাই করাও দারুণ কঠিন কাজ। আর এ জন্যেই ফরজ বিষয়ের ন্যায় ওয়াজিব বিষয়ের কোন সঠিক ও পরিপূর্ণ লিস্টও মুসলমান জাতির সামনে আজ নেই। বর্তমানে অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান বেতেরের নামাজ, ঈদের নামাজ এবং নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি ইবাদাতগুলোর ওয়াজিব রুকনগুলোকেই শুধু ওয়াজিব হিসেবে জানে।

**গ. হাদীসের মধ্যে গুরুত্ব অনুযায়ী যেগুলোর অবস্থান তৃতীয়, ফিকাহ শাস্ত্র তার যে নাম দিয়েছে তা নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা**

গুরুত্ব অনুযায়ী যে হাদীসগুলোর অবস্থান তৃতীয় স্থানে, ফিকাহ শাস্ত্র তার নাম দিয়েছে সুন্নাত। ফরজ ও ওয়াজিব বিষয়গুলোর সঠিক ও পরিপূর্ণ তালিকা না থাকা এবং তৃতীয় অবস্থানের হাদীসগুলোকে আবার সুন্নাত নাম দেয়ায় বর্তমান মুসলমান সমাজে, ইসলাম পালনের ব্যাপারে এক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু ১ম ও ২য় অবস্থানের হাদীসগুলোর সঠিক ও পরিপূর্ণ লিস্ট নেই সেহেতু অসতর্ক লিস্টে উপস্থাপন করা কয়েকটি আমল বা কাজ বাদে ইসলামের অন্য



সকল বিষয়কে সাধারণ মুসলমানগণ সুন্নাহ হিসেবে জানে। আর এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তারা জানে ফিকাহ শাস্ত্রের বা শরীয়াতের সুন্নাতগুলোকে অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর সুন্নাহের গুরুত্ব অনুযায়ী তৃতীয় অবস্থানে অবস্থিত সুন্নাহগুলোকে। ফিকাহ শাস্ত্রের বা শরীয়াতের ঐ সুন্নাতের কয়েকটি হচ্ছে- নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি ইবাদাতের সুন্নাত বিষয়গুলো, টুপি বা পাগড়ি মাথায় দেয়া, দাড়ি রাখা, মিষ্টি খাওয়া, মেছওয়াক করা, আতর মাখা, মাটিতে বসে দস্তরখান বিছিয়ে খাওয়া ইত্যাদি। তাই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান হাতে গোনা কয়েকটি বাদে, রাসূলের সুন্নাহের ১ নং ও ২ নং অবস্থানে অবস্থিত অনেক সুন্নাহকে বাদ দিয়ে, ৩ নং অবস্থানের সুন্নাহকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের দুনিয়ার জীবন যেমন আজ ব্যর্থ হচ্ছে অর্থাৎ তাদের দুনিয়ার জীবনে আজ যেমন শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি এবং প্রগতি নেই তেমনই তাদের আখেরাতের জীবনও ব্যর্থ হবে বলেই মনে হয়।

তাই মুসলমান জাতির মধ্যে যারা আজ সিদ্ধান্ত দেয়ার অবস্থানে আছেন, তাদের নিকট আকুল আবেদন, ফিকাহ শাস্ত্রে রাসূলের (সা.) সুন্নাহের গুরুত্ব অনুযায়ী দেয়া সংজ্ঞা ও নামকরণ নিয়ে আবার চিন্তা-গবেষণা করার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে এবং জাতিকে এই অনিচ্ছাকৃত অকল্যাণ থেকে মুক্তি দিতে।

## রাসূলের (সা.) এর হাদীসকে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ করার সহজ উপায়

চলুন এখন দেখা যাক, রাসূলের (সা.) হাদীসকে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ করার সহজ কোন উপায় আছে কিনা। বিষয়টি বুঝতে হলে কুরআন ও সুন্নাহের নিম্নোক্ত তথ্যগুলো আগে জানা দরকার-

**তথ্য-১**

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

**অর্থঃ** তিনি (আল্লাহ) নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ (কুরআন) পাঠ করে শুনান। তাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেন। (জুময়া : ০২)

**ব্যাখ্যাঃ** এখানে মুসলমানদের গড়ে তোলার জন্যে রাসূল (সা.) কী কী কাজ করতেন, তা বলা হয়েছে। আল-কুরআনের আরো তিন জায়গায় (বাকারাঃ ২৯ ও ১৫১ এবং আল-ইমরানঃ ১৬৪) একই ধরনের কথা বলা হয়েছে। এখানে

বলা হয়েছে মুসলমানদের গড়ে তোলার জন্যে রাসূল (স.) চার ধরনের কাজ করতেন। যথা–

১. কুরআন তেলাওয়াত করে শুনানো অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্যগুলো সাধারণভাবে পড়ে পড়ে জানিয়ে দেয়া। এটাই ছিল মুসলমানদের গড়ার ব্যাপরে তাঁর প্রথম কাজ।
২. পবিত্র করা। অর্থাৎ কুরআন তথা ওহীর জ্ঞান অনুযায়ী তিনি মুসলমানদের চরিত্রকে ঢেলে সাজাতেন।
৩. কিতাবের জ্ঞান দেয়া। অর্থাৎ কুরআনের যে সকল স্থানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন সেগুলো কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে দিতেন।
৪. জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া। অর্থাৎ ইসলামকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান দরকার তারও শিক্ষা দিতেন।

এখান থেকে বুঝা যায়, কুরআনের বক্তব্যগুলো কথা ও কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের সাধারণভাবে এবং ব্যাখ্যা করে জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়া ছিল মানুষ গড়ার ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর প্রথম কাজ।

**তথ্য-২**

প্রশ্ন আসতে পারে রাসূল (সা.) যে কুরআনের সকল বক্তব্য, তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের সাধারণভাবে ও ব্যাখ্যা করে জানিয়েছিলেন, তার প্রমাণ কী? দু'একটা বক্তব্য তিনি কথা ও কাজের মাধ্যমে না-ও জানিয়ে থাকতে পারেন। না এটা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, পূর্বে উল্লিখিত সূরা বাকারার ৮৫নং ও সূরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, আল-কুরআনের একটি মূল বিষয়ও কেউ অনুসরণ না করলে তার সকল কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হবে এবং তাকে দোযখে যেতে হবে। তাই রাসূল (সা.) কুরআনে উল্লেখিত একটি বিষয়ও নিজে করেননি বা অপরকে করতে বলেননি, এমনটি হতেই পারে না।

**তথ্য-৩**

আবার প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের দু' একটা বক্তব্য ভুলে যাওয়ার দরুন রাসূল (সা.) মুসলমানদের জানাননি, এমনটিও তো হতে পারে। না, তাও হতে পারে না। কারণ আল-কুরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূল (সা.) কুরআনে উল্লেখিত একটি বিষয়ও যাতে ভুলে না যান, সে



দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। তথ্যটি আল্লাহ জানিয়েছেন সূরা ক্বিয়ামাহের ১৬ ও ১৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আয়াত দু'টি হচ্ছে-

**لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ.**

**অর্থঃ** (হে নবী, নাযিলের সময় কুরআনকে) তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্যে আপনার জিহ্বাকে নাড়াবেন না। এটা মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব।

**ব্যাখ্যাঃ** কুরআন নাযিল শুরু হওয়ার প্রথম দিকে, ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.) এর নিকট থেকে কোন আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে , বারবার উচ্চারণ করে রাসূল (সা.) তা মুখস্থ করে নেয়ার চেষ্টা করতেন। রাসূল (সা.) এর এই প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে জিব্রাইল (আ.) এখানে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের কোন কথা তিনি যাতে কোনভাবে ভুলে যেতে না পারেন, সে দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। তাই কুরআনের কোন বক্তব্য ভুলে যাওয়ার দরুন রাসূল (সা.) করেননি বা বলেননি, এমনটি হতে পারে না।

④④ উপরের তথ্যগুলো জানার পর একথা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে, রাসূল (সা.) কুরআনে উল্লেখিত সকল বিষয় নিজের কাজ, কথা ও সমর্থনের মাধ্যমে মুসলমানদের সাধারণভাবে এবং ব্যাখ্যা করে, জানিয়ে এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন। তবে রাসূল (সা.) এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি আরো কিছু কাজ করেছেন বা কথা বলেছেন, যা কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা কুরআনের কোন বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক নিয়ম- কানুনও নয়। সংজ্ঞা অনুযায়ী রাসূল (সা.) করেছেন, বলেছেন বা সর্মথন করেছেন এমন সকল কাজই রাসূলের সুন্নাহ এবং তা ইসলামের বিষয়। তাই সেগুলোও রাসূলের সুন্নাহ অর্থাৎ মুসলমানদের জন্যে পালনীয়। অন্য দিকে এটা বুঝাও মোটেই কঠিন নয় যে, রাসূল (সা.) এর সকল সুন্নাহ সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ অবশ্যই কোনটি বেশি এবং কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ হবে।

## বেশি ও কম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো সে ব্যাপারে উল্লেখিত তথ্যসমূহের সারসংক্ষেপ

সুন্নাহ ও হাদীস সম্বন্ধে উল্লেখিত তথ্যগুলো জানার পর সহজেই বলা যায় যে, বেশি ও কম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণিত হবে নিম্নের গুণাগুণের ভিত্তিতে–

**ক. বেশি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস**

১. যে হাদীসের বক্তব্য কুরআনের বক্তব্যের অনুরূপ তার বর্ণনাধারায় (সনদে) কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

২. যে হাদীস কুরআনের কোন মূল বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) এবং তা সনদের ভিত্তিতে অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু তা কুরআনের কোন বক্তব্যের বিরুদ্ধ নয়

**খ. কম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস**

১. যে সহীহ হাদীস কুরআনের কোন মূল বক্তব্যের অনুরূপ বা তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয় নয় এবং তার বক্তব্য কুরআনের কোন বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী নয়।

**গ. হাদীস নয়**

যে হাদীস কুরআনের কোন বক্তব্যের বিরুদ্ধ।

## শেষ কথা

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে তাহলে এ কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, ইসলামী জীবন অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হতে হলে যে বিষয়টি সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল কুরআনের জ্ঞান। আর তাই কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে সকল মুসলমানের জন্যে সব থেকে বড় সওয়াবের কাজ হচ্ছে কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা। আর ইবলিস শয়তানের সব থেকে বড় কাজ অর্থাৎ সব গুনাহের বড় গুনাহ হল কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ' নামক বইটিতে।

কুরআনের জ্ঞানের ব্যাপারে বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা দেখলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইবলিস শয়তান তার ১ নং কাজের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য রকমভাবে সফল হয়েছে। শয়তান এ কাজটি করেছে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে প্রতিটি স্তরে সুকৌশলে বাধা সৃষ্টি করে। ইবলিস শয়তান তো তার ১ নং কাজে সফলকাম হওয়ার চেষ্টা করবেই। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, একটি জাতির অধিকাংশ সদস্য, ইবলিস শয়তানের সেই ধোঁকাগুলোকে কল্যাণকর (সওয়াব) কথা ভেবে ব্যাপকভাবে মেনে নিয়েছে এবং তার উপর আমল করে যাচ্ছে। ধাপ অনুযায়ী ইবলিস শয়তানের সেই ধোঁকাবাজিমূলক কথা বা কাজগুলো হচ্ছে–



**১.কুরআনের জ্ঞান অর্জনকে নিরুৎসাহিত করা**

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করার ব্যাপারে ইবলিস শয়তানের কাজের প্রথম ধাপ হচ্ছে এটি। যে যে কাজ বা কথার মাধ্যমে ইবলিস শয়তান এটা করেছে তা হচ্ছে-

ক. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা যে, সকল মুমিনের ১ নং কাজ অর্থাৎ সব থেকে বড় সওয়াবের কাজ এবং তা না করা যে সকল মুমিনের সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ- এই তথ্যটা মুসলিমদের দৃষ্টির অগোচরে নিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে ইবলিস শয়তান অবিশ্বাস্য রকমভাবে সফল হয়েছে।

খ. কুরআন বুঝা অত্যন্ত কঠিন এবং বুঝার চেষ্টা করলে গুমরাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই কুরআন নাবুঝে পড়াই ভাল। এ কথাটাও ব্যাপকভাবে প্রচারিত।

গ. জানার থেকে আমলের গুরুত্ব বেশি।

ঘ. জেনে না করলে বেশি শাস্তি। তাই কম জানাই ভাল।

(বিষয়গুলো নিয়ে পূর্বোল্লিখিত বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।)

**২. কুরআন যেন কেউ সহজে ধরে পড়তে না পারে সে ব্যবস্থা করা**

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে ইবলিস শয়তানের প্রথম বাধাকে উপেক্ষা করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে এগুতে চায়, তারা যাতে ইচ্ছা করলেই কুরআন ধরে পড়তে না পারে সে জন্যে ইবলিস শয়তান ধোঁকাবাজি করে মুসলমান সমাজে যে কথাটা চালু করে দিয়েছে তা হচ্ছে, 'ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা মহাপাপ'। আর বর্তমান বিশ্বের মুসলমানরা কথাটা ব্যাপকভাবে মেনে নিয়েছে। একজন মুসলমানের জাগ্রত অবস্থায় বেশির ভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই কথাটার প্রভাবে, ইচ্ছা থাকলেও জাগ্রত অবস্থায় বেশির ভাগ সময় মুসলমানরা কুরআন ধরে পড়তে পারে না। কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়ে এ কথাটাও কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে এক বিরাট বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। অথচ ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপের কাজ এমন কোন কথা কুরআন ও হাদীসে নেই। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা?' শিরোনামের বইটিতে।

**৩. কুরআন পড়েও মুসলমানরা যাতে তার জ্ঞান অর্জন না করতে পারে সে ব্যবস্থা করা**

ধোঁকাবাজির প্রথম দু'টি ধাপ অতিক্রম করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে অগ্রসর হয় ইবলিস শয়তান তাদেরকে আর এক অভিনব ধোঁকাবাজিমূলক কথার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। সে কথাটি হচ্ছে 'অর্থছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী'। কথাটি অর্থছাড়া কুরআন পড়াকে শুধু অনুমতিই দেয় না, তা দারুণভাবে উৎসাহিতও করে।

এই কথাটার প্রভাবে সারা বিশ্বের অসংখ্য মুসলমান আজ বেশি বেশি সওয়াব কামাই করার উদ্দেশ্যে না বুঝে কুরআন খতম দেয়ার জন্যে ব্যস্ত। কারণ, অর্থসহ বা বুঝে পড়তে গেলে অর্থছাড়া পড়ার চেয়ে একই সময়ে কম অক্ষর পড়া হবে আর তাই সওয়াবও কম হবে। ফলে কুরআন পড়েও তারা কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে। অর্থাৎ কথাটি শয়তানের ১ নং কাজকে সফল করতে দারুণভাবে সাহায্য করছে। অথচ ঐ রকম কোন কথা কুরআন বা হাদীসের কোথাও নেই বরং তথায় এর উল্টো অনেক কথা আছে। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থছাড়া কুরআন পড়লে গুনাহ না সওয়াব?' নামক বইটিতে।

**৪. কুরআন জানার পর মুসলমানরা যাতে তার সকল বিষয়ে আমল করতে অগ্রসর না হয়, তার ব্যবস্থা করা।**

উপরের তিনটি ধাপ অতিক্রম করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করে তারা যাতে আল-কুরআনের সকল বিষয়ের ওপর আমল করতে অগ্রসর না হয়, ইবলিস শয়তান সে চেষ্টা করে। কারণ ইবলিস জানে, কুরআনের কিছু অনুসরণ করলে আর কিছু অনুসরণ না করলে মুসলমানরা ইসলামের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। এ জন্যে সে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদের এ কথা বিশ্বাস করাতে বা গ্রহণ করাতে চায় যে, আল-কুরআনের কিছু কিছু বক্তব্য ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি জাতির জন্যে প্রযোজ্য, মুসলমানদের জন্যে নয়। প্রচারণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য থেকে মুসলমানদের শিক্ষা নেয়ার আছে। তা না থাকলে মহান আল্লাহ ঐ বক্তব্যগুলো কাগজের পাতায় লেখার মাধ্যমে তার সৃষ্টির কাগজ ও কালি রূপের অপরিসীম সম্পদ এবং তা পড়া ফরজ করিয়ে দিয়ে মানুষের অপরিসীম সময়ও নষ্ট করতেন না। কারণ, মহান আল্লাহ নিজেই আল-কুরআনের মাধ্যমে (বনী ইসরাইল : ২৭) জানিয়ে দিয়েছেন, 'সম্পদ ও সময়ের অপচয়কারী শয়তানের ভাই'।



সবশেষে চলুন, আমরা সবাই মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন মুসলমান জাতির সবাইকে সব ফরজের বড় ফরজটি পালন করার তৌফিক দান করেন। যে মুসলমান তা করতে পারবেন তিনিই কেবল জানতে ও বুঝতে পারবেন ইসলামের মৌলিক কাজ কোনগুলো আর অমৌলিক কাজ কোনগুলো এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো আর কম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো। ফলে তিনিই কেবল সক্ষম হবেন মৌলিক আমল এবং গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহের একটিও বাদ না দিয়ে ইসলামী জীবন পরিচালনা করতে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব হতে।

পুস্তিকায় কোন ভুল ধরা পড়লে গঠনমূলক ভাবে আমাকে জানিয়ে দেয়া পাঠকের ঈমানী দায়িত্ব। সে সংশোধন সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো আমার ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ হাফিজ!

**সমাপ্ত**

## লেখকের বইসমূহ

**বের হয়েছে –**

- **পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –**

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল (আ.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি–মানুষ রচিত আইন না কুরআনের আইন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি?



**বের হওয়ার অপেক্ষায় –**

⑥ **পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –**

১. সঠিক স্থানে ভোট দেয়া কত বড় সওয়াব এবং ভোট না দেয়া বা ভুল স্থানে দেয়া কত বড় গুনাহ

## প্রাপ্তিস্থান

⑥ আধুনিক প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১
শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ফোন: ৯৩৩৯৪৪২

⑥ ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭

⑥ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫

⑥ আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮

⑥ তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন:০১৭১২-০৪৩৫৪০

⑥ ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন: ৮৬২৫০৯৭

⑥ মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬

⑥ এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে